Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অশ্বঘোষের সাহিত্যে নারী : একটি পর্যালোচনা

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মালবিকা বিশ্বাস
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.3
Pages	৫৫-৬৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অশ্বঘোষের সাহিত্যে নারী : একটি পর্যালোচনা

মালবিকা বিশ্বাস*

সার-সংক্ষেপ : কালজয়ী মহাকবি অশ্বঘোষ সৃজনশীল ও মৌলিক প্রতিভার দিক থেকে সংস্কৃতসাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রসম। তাঁর প্রতিভার দীপ্তছটায় সংস্কৃতসাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর রচনার ব্যাপ্তি বহুমুখী যা একই সঙ্গে কাব্যরূপ ও দার্শনিকতত্ত্বে সমৃদ্ধ। সমাজজীবন এবং সমাজজীবনের প্রান্তিক নানা শ্রেণি পেশার মানুষের জীবনকাহিনি, সুখ-দুঃখ এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অশ্বঘোষের প্রধান দুটি মহাকাব্য : *বুদ্ধচরিতম্* ও *সৌন্দরনন্দম্* এবং একটি নাটক *শারিপুত্র প্রকরণম্*-এ বিধৃত নারীজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে এবং সমাজে তাদের অবস্থানের দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা আরো দেখাতে চেষ্টা করব যে, অশ্বঘোষও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একজন প্রতিনিধি এবং সেই প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি নারীজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি, অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন থেকেছেন, কিংবা উপেক্ষা করেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে যেসব কালজয়ী ঋদ্ধপুরুষ আপন সৃজনশীলতায়, বহুমুখী ও বিচিত্র প্রতিভায় উজ্জ্বল, তাঁদের মধ্যে অশ্বঘোষ উল্লেখযোগ্য। জন্মসূত্রে তিনি ব্রাহ্মণ; কিন্তু যৌবন-প্রারম্ভে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে ত্রিবেদ ও কলাবিদ্যা যেমন তাঁর অধীত বিষয় ছিল, তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও সমকালীন ভারতীয় দর্শনেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর বহুমুখী ও বিচিত্র প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে জ্যোতির্বিদ্যায়, কলাবিদ্যায়, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্রে, সর্বোপরি বৌদ্ধদর্শনে। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন গায়ক, সুরকার, গীতিকার, ধর্মপ্রচারক ইত্যাদি। এ সবকিছু ছাপিয়ে তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন মহাকবি হিসেবে। তাই অশ্বঘোষ সুধীসমাজে মহাকবি হিসেবেই সুপরিচিত।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অশ্বঘোষের জীবনকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও নানা তথ্য-উপাত্ত থেকে পণ্ডিতগণ ১ম শতাব্দীকেই তাঁর সময়কাল বলে উল্লেখ করেন। এদিক থেকে অশ্বঘোষকে রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক বলে উল্লেখ করা হয় (গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১৯৮০ : ভূমিকা-২১)। ঐতিহাসিক দিক থেকে অশ্বঘোষ মহাকবি বাল্মীকির যোগ্য উত্তরসূরি এবং প্রখ্যাত নাট্যকার ভাস ও মহাকবি কালিদাসের চির অনুপ্রেরণার উৎস। বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ এই মহাকবিকে সূর্যের আলোকরশ্মির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম জগৎকে সূর্যের ন্যায় আলোকিত করেছে (গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১৯৮০ : ভূমিকা-২১ এবং Muller, F. Max, 1894 : 9)। মরিস ভিন্টারনিৎসও এ প্রসঙ্গে বলেন :

> Until the year 1892, when the French scholar Sylvain Levi published the first chapter of the Buddha-Carita, little more than the name of Aśvaghosa was known in Europe. To-day we know him as one of the most prominent poets of Sanskrit literature, as the most important predecessor of Kalidasa, and as the creator of epic, dramatic and lyrical compositions; but of his life we know little. (Winternitz, Maurice, 1991 : 256)

সমসাময়িক অন্য কবি-সাহিত্যিকদের মতো অশ্বঘোষও ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ। তাঁদের মতো অশ্বঘোষেরও ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল তাঁর সৃষ্টিকর্ম সার্থক হোক। ফলে অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয়, অশ্বঘোষের সৃষ্টিকর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দেয়। তবে বিদ্বৎসমাজ নিম্নলিখিত তিনটি গ্রন্থকে তাঁর একান্ত নিজস্ব সাহিত্যকর্ম বলে উল্লেখ করেন :

১. *বুদ্ধচরিতম্*
২. *সৌন্দরনন্দম্*
৩. *শারিপুত্রপ্রকরণম্*

প্রথমোক্ত দুটি গ্রন্থ মহাকাব্য হিসেবে এবং তৃতীয় গ্রন্থটি নাট্যগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। মূলত এই তিনটি গ্রন্থের কারণেই অশ্বঘোষ জগৎসভায় মহাকবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্য শাস্ত্রবিশারদ এস. কে. দে-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> The three works, which are known for certain to be Aśvaghosa's, are: the *Buddha-carita*, the *Saundarananda* and the Śā*riputra-prakarana*; and his fame as a great Sanskrit poet rests entirely on these. (Dasgupta, S. N and S. K. De, 1947 : 73)

সংস্কৃত-সাহিত্যবিশারদ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে এস. কে. দে-এর উপর্যুক্ত মন্তব্যের সমর্থন করে বলেন, 'অশ্বঘোষের নামে

প্রচলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ নামক মহাকাব্য এবং শারিপুত্রপ্রকরণ নামক নাটক নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব কৃতি।' (ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮ : ১১০)

এছাড়াও অশ্বঘোষ-গবেষকগণ মনে করেন যে, অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে : *মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র*, *বজ্রসূচী*, *সূত্রালংকার*, *গণ্ডীস্তোত্রগাথা*, *ত্রিদণ্ডমালা* ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার রচনা। আবার কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, তাঁর *প্রতীক নাটক* ও *রাষ্ট্রপাল* নামক আরও দুটি নাট্যগ্রন্থও রয়েছে। এই দুটি গ্রন্থের খণ্ডিতাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নাট্যকার বা রচনার নাম উদ্ধার করা যায়নি। তাই উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত কিনা – তা নিয়ে গবেষকগণ সন্দেহপোষণ করেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অশ্বঘোষ প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ভিত্তি প্রদান করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ভাস, কালিদাস এবং শূদ্রকের নাটক রচিত হয়।

অশ্বঘোষের রচনার বিষয়বস্তু দর্শনতত্ত্বে সমৃদ্ধ হলেও তা ছিল সর্বতোভাবে কাব্যরসে পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর রচনায় উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকার প্রয়োগে প্রতিটি কাব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। সংস্কৃত ভাষাকে মূল অবলম্বন করে তাঁর বিভিন্ন রচনাকর্ম সম্পাদিত হলেও নিম্নশ্রেণির চরিত্রকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্য তিনি শৌরসেনী, মাগধী ইত্যাদি প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার করেন। তাই 'ভাবের জন্য নয়', অশ্বঘোষ মূলত ভাষার জন্যই পাঠককে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাই বলা হয়, 'অশ্বঘোষ প্রধানত ভাষাপ্রিয় কবি'। (গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১৯৮০ : ১৮)

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে একদিকে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন সমাজজীবনের চিত্র, অন্যদিকে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজজীবনের নানা শ্রেণিপেশার মানুষ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখের কাহিনি এবং তাদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা অশ্বঘোষ বিরচিত *বুদ্ধচরিতম্*, *সৌন্দরনন্দম্* এবং *শারিপুত্রপ্রকরণম্*-এ আলোচিত নানা শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে নারীজীবনের বিষয়টি তুলে ধরতে প্রয়াসী হব।

বুদ্ধচরিতম্ : সাধারণত বলা হয়ে থাকে, অশ্বঘোষ *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* কবিকল্পিত রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে গৌতমবুদ্ধকে তদ্রূপ মহামানবীয় চরিত্ররূপে অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণে এবং আর্যসত্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে তিনি এই মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁর সুললিত শৈল্পিক ভাষা, রচনাশৈলী, কাব্যিক-কল্পনা দৃষ্টিভঙ্গি, অলংকার, উপমা-রূপক ইত্যাদি মিলিয়ে *বুদ্ধচরিতম্* গ্রন্থটি মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। সপ্তম শতকের তিব্বতের বৌদ্ধ গবেষক I-tsing (ইৎসিঙ) *বুদ্ধচরিতম্* মহাকাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

> *Buddhacarita* is widely read or sung throughout the five divisions of India and the countries of Southern Sea. Aśvaghosa clothes manifold meanings and ideas in a few words, which rejoice the heart of the reader, so that he never feels tired of reading the poem. Besides, it should be counted as meritorious for one to read this book, in as much as it contains, the noble doctrine, given in a concise form.
>
> Thus Aśvaghosa through his *Buddhacarita*, has made Buddha rank amongst the incarnations of god like Rama, Krishna, etc. (Khosla, Sarla, 1986 : 15)

বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যটি গৌতমবুদ্ধের জীবনাবলম্বনে রচিত অশ্বঘোষের অমর ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ কাব্যটি মোট ২৮টি সর্গে রচিত হলেও ১ম সর্গ থেকে ১৪শ সর্গ পর্যন্ত অশ্বঘোষের মূল রচনা। কিন্তু এর মধ্যেও ১ম ও ১৪শ সর্গের বেশ কিছু শ্লোক পাওয়া যায়নি। (Dasgupta, S. N and S. K. De, 1947 : 73 এবং ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮ : ১১২-১১৩)

আমরা নিম্নে অশ্বঘোষ বিরচিত *বুদ্ধচরিতম্*-এর সর্গের নাম এবং কাহিনি-সংক্ষেপ আলোচনা করব :

১ম সর্গ	:	ভগবানের জন্ম
২য় সর্গ	:	অন্তঃপুর বিহার
৩য় সর্গ	:	উদ্বেগের উৎপত্তি
৪র্থ সর্গ	:	নারী-প্রত্যাখ্যান
৫ম সর্গ	:	অভিনিষ্ক্রমণ
৬ষ্ঠ সর্গ	:	ছন্দক বিসর্জন
৭ম সর্গ	:	তপোবন প্রবেশ
৮ম সর্গ	:	অন্তঃপুরে বিলাপ
৯ম সর্গ	:	কুমারের অন্বেষণ
১০ম সর্গ	:	বিম্বসারের আগমন
১১শ সর্গ	:	কামনিন্দা
১২শ সগ	:	অরাড়-দর্শন
১৩শ সর্গ	:	মার বিজয়
১৪শ সর্গ	:	বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

অশ্বঘোষ উপর্যুক্ত সর্গগুলোতে গৌতমবুদ্ধের যে জীবনচরিত কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন তার কাহিনি-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে লুম্বিনী বনে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। তাঁর জন্মলগ্নেই নানা অলৌকিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করলে রাজার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু অসিত নামে এক মহর্ষি তপস্যার দ্বারা জেনেছিলেন যে, এই পুত্র জগতের জ্ঞানসূর্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম এবং ধনদান সমাপনে রাজা নিজ বাসগৃহ কপিলাবস্তুতে প্রবেশ করেন। পুত্রের জন্মের পর থেকেই রাজপরিবার এবং রাজ্যের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দেখে রাজমহিষী মায়াদেবী আনন্দ সংবরণ করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করলে মাতৃস্বসা গৌতমী লালনপালনের ভার নেন সিদ্ধার্থের। যথাসময়ে যৌবনে প্রবেশ করে যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং রাহুল নামে তাঁদের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। একদা বনে ভ্রমণকালে আকস্মিকভাবে জরা, ব্যাধি এবং মৃতব্যক্তি প্রত্যক্ষণ করে সিদ্ধার্থের ভাবান্তর হয়। ফলে তিনি গৃহত্যাগ করে পরমসত্য উদ্ঘাটনের জন্য পদ্মষণ্ড বনে নবীন ব্রহ্মচারী রূপে প্রবেশ করেন। এখানে বহু কমার্তা নারী তাঁকে সংসারজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রলুব্ধ করে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি নিজ গৃহে ফিরে এসে গৃহত্যাগের জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। পিতৃ-অনুমতি না পেয়েও তিনি গৃহত্যাগ করে পরমসত্য অনুসন্ধানের নিমিত্তে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি গৃহে ফিরে এলে স্ত্রীসহ সকলেই তাঁকে নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা সংসারজীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে গৃহত্যাগ করে অরাড় মুনির আশ্রমে গমন করেন। সেখানেও তাঁর অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় তিনি অবশেষে গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যানস্থ হন। এ সময় তিনি সদ্ধর্মের শত্রু মার এবং তার সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হন। কিন্তু তাদের আক্রমণে সিদ্ধার্থ অবিচল ও অচঞ্চল থাকেন। তখন মারের প্রতি আকাশবাণী হয় যে, তিনি যেন বৃথা শ্রম না করেন এবং পুণ্যকর্মের ফলে সিদ্ধার্থ তখনই বোধিলাভ করবেন। ফলে মার সৈন্যসহ সেই স্থান ত্যাগ করেন। অতঃপর সিদ্ধার্থ ধ্যানস্থ হয়ে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর প্রবহমান ধারা স্মরণ করে উপলব্ধি করেন যে, এই জগৎ-সংসার কদলী বৃক্ষের ন্যায় অসার – 'কদলীগর্ভনিঃসারঃ সংসার ইতি নিশ্চয়ঃ'। তিনি পরমসত্য, অর্থাৎ, জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্পর্কে অবগত হন এবং জীবের পাপের ফলভোগ দেখে তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হয়। জীব তার কুকর্মের ফলেই নরকে প্রবেশ করে। আবার কেউবা মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। আর এভাবেই তিনি বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হন।

অশ্বঘোষ তাঁর *বুদ্ধচরিতম্* মহাকাব্যে গৌতমবুদ্ধের জীবনীকে পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্তরূপ দেওয়ার প্রয়াসে বাস্তব চরিত্র ছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে বেশ কিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এসব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নর-নারী, দেবদেবী, অপ্সরা ইত্যাদি। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে এই মহাকাব্যের শুধু বাস্তব নারীচরিত্রের জীবনকাহিনি আলোচনা করব।

আমরা অশ্বঘোষ বিরচিত মহাকাব্য *বুদ্ধচরিতম্*-এর নারীচরিত্রসমূহকে নিম্নলিখিত দুইভাগে ভাগ করতে পারি :

১। বাস্তব নারীচরিত্র :

মায়াদেবী (সিদ্ধার্থের মাতা)

গৌতমী (সিদ্ধার্থের মাতৃষ্বসা)

যশোধরা (সিদ্ধার্থের পত্নী)

২। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নারীচরিত্র :

অহল্যা (৪/৭২)
উর্বশী (৯/৯, ১১/১৫)
কালী (৪/৭৬)
গঙ্গা (৯/২৫)
গৌতম মন্থাল (৪/১৭)
ঘৃতাচী (৪/২০)
জুহ্বতী (৪/৭৫)
পার্বতী (১/৬১, ১৩/১৬)
বিশ্বাচী (৪/৭৮)
মমতা (৪/৭৪)
মারুতী (৪/৭৪)
মাদ্রী (৪/৭৯)
রোহিণী (৪/৭৩)
লোপামুদ্রা (৪/৭৩)
শচী (২/২৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মায়াদেবী : মায়াদেবী কপিলাবস্তু নগরের রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী, সিদ্ধার্থের মাতা, গৌতমীর ভগ্নী এবং যশোধরার শশ্রূমাতা। মায়াদেবী 'পৃথিবীর মতোই গৌরবময়ী'। সংসারজীবনে তিনি অত্যন্ত সুখী এবং রাজা সকল বিষয়েই তাঁর সঙ্গ লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, 'লোককল্যাণে'র জন্য তিনি গর্ভধারণ করেছেন। অশ্বঘোষের ভাষায় :

> আসীন্মহেন্দ্রাদিসমস্য তস্য পৃথ্বীর গুর্বী মহিষী নৃপস্য।
> মায়েতি নাম্নী শিবরত্নসারা শীলেন কান্ত্যাংপ্যধিদেবতেব ॥
> দৈবৈরভিপ্রার্থ্যমনল্পভোগং সার্ধং তয়াংসৌ বুভুজে নৃপালঃ।
> সা চাথ বিদ্যেব সমাধিযুক্তা গর্ভং দধে লোকহিতায় সাধ্বী ॥
>
> *বুদ্ধচরিতম্*, ১/২-৩ (অশ্বঘোষ, ১৯৭৮ : ১১০)

মায়াদেবী বিশ্বসভ্যতায় অতি সুপরিচিত এই কারণে যে, তিনি পৃথিবীখ্যাত বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের প্রবক্তা সিদ্ধার্থ তথা গৌতমবুদ্ধের মাতা। সমাজ-সংসারে এই তাঁর পরিচয় এবং আর দশটি নারীর মতো পুত্রসন্তান জন্মদানে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। অবশ্য তাঁর পুত্র আর দশজন পুত্রের চেয়ে জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার-আচরণে এবং মানবসেবায় একেবারেই ব্যতিক্রম। সর্ববিষয়ে সিদ্ধ বলে তাঁর পুত্র 'সবার্থসিদ্ধ'। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পুত্রের মধ্যে দেবতার মতো প্রভাব দেখে তিনি আনন্দ সংবরণ করতে পারেননি এবং পুত্রের জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পূর্বেই অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তৎকালীন পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে রাজমহিষীর অন্য কোনো ভূমিকা অত্যন্ত বিরল এবং তাঁদের জীবন-পরিক্রমা অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ। মায়াদেবীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি একজন সার্থক বধূ হিসেবে সংসারধর্ম পালন করেছেন, সার্থক মাতা হিসেবে সৎপুত্রের জন্ম দিয়েছেন এবং অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনলীলা শেষ করেছেন।

গৌতমী : গৌতমী রাজমহিষী মায়াদেবীর ভগ্নী, সিদ্ধার্থের মাতৃষ্বসা (মাসি) এবং শুদ্ধোদনের শ্যালিকা। গৌতমী ভগ্নীর বাড়িতেই জীবনযাপন করেছেন এবং ভগ্নীর মৃত্যুর পর দেবতাতুল্য ভগ্নীপুত্রকে সযত্নে ও মাতৃস্নেহে লালনপালন করে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে উপনীত করেন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসারে উপনয়ন, সংস্কার ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সিদ্ধার্থের যথোপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণেও সহায়তা করেন। মাতৃস্নেহে লালনপালন করে তিনি সিদ্ধার্থের বিবাহকার্য সম্পাদনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আমরা গৌতমীকে তাই একজন সার্থক নারী হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ গৌতমী যথার্থ মাতৃস্নেহ ও অনুরাগে সিদ্ধার্থকে গড়ে তুলেছেন। অশ্বঘোষের ভাষায় :

> ততঃ কুমারং সুরগর্ভকল্পং স্নেহেন ভাবেন চ নির্বিশেষম্।
> মাতৃস্বসা মাতৃসমপ্রভাবা সংবর্ধনায়াত্মজবদ্ বভূব ॥
>
> *বুদ্ধচরিতম্*, ২/১৯ (অশ্বঘোষ, ১৯৭৮ : ১১৭)

মাতৃস্নেহাভাবের কথা সিদ্ধার্থ কখনও অনুভব করেননি। ফলে সিদ্ধার্থ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এছাড়া সমাজে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে গৌতমীর আর কোনো ভূমিকা আছে বলে জানা যায় না।

যশোধরা : যশোধরা সিদ্ধার্থের সহধর্মিণী, রাহুল-জননী, রাজা শুদ্ধোদন ও রানি মায়াদেবীর পুত্রবধূ এবং গৌতমীর ভাগ্নে-বধূ। যশোধরা উচ্চবংশীয়, সাধ্বী, রূপবতী, লজ্জাবতী, বিনয়ের আধার, লক্ষ্মীতুল্য ইত্যাদি গুণে বিভূষিত। স্বাভাবিক গার্হস্থ্যজীবনে সিদ্ধার্থের মন যাতে আকৃষ্ট থাকে সে-কারণেই রাজা শুদ্ধোদন এরূপ সর্বগুণে গুণান্বিত কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচিত করেন। বিবাহিত-জীবনের

একটি পর্যায় পর্যন্ত যশোধরা সার্থক বধূ হিসেবে গৃহকার্য সম্পাদন করেন এবং যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তানের জন্মও দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ইত্যাদি প্রত্যক্ষণ করে সিদ্ধার্থের ভাবান্তর হলে যশোধরার জীবন এক ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়। সিদ্ধার্থের এই ভাবান্তর তাঁকে কামনা-বাসনাবিমুখ এবং গৃহত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। তাই সিদ্ধার্থ এক নিশীথ রাতে পতিব্রতা স্ত্রী এবং একমাত্র অবোধ শিশুসন্তানকে না জানিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গৃহত্যাগ করেন। একজন সহজ-সরল নারীর জীবনে স্বামীর এরূপ গৃহত্যাগকে আমরা সিদ্ধার্থের একরকম পলায়নী মনোবৃত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। সিদ্ধার্থের এই পলায়নী মনোবৃত্তিতে যশোধরা যে সন্তুষ্ট ছিলেন না – এর ইঙ্গিত বিভিন্ন স্থানে কাব্যকার উল্লেখ করেছেন। আমরা যশোধরার বিলাপ থেকেই তাঁর এই মনোভাবের কথা জানতে পারি। যেমন, যশোধরা বিলাপ করে বলেছেন :

> স মামনাথং সহধর্মচারিণীমপাস্য ধর্মং যদি কর্তুমিচ্ছতি।
> কুতোঽস্য ধর্মঃ সহধর্মচারিণীং বিনা তপো যঃ পরিভোক্তুমিচ্ছতি ॥
> শৃণোতি নূনং স ন পূর্বপার্থিবান্মহাসুদর্শপ্রভৃতীন্ পিতামহান্ ।
> বনানি পত্নীসহিতানুপেয়ুষ স্তথা হি ধর্মং মদৃতে চিকীর্ষতি ॥
> মখেষু বা বেদবিধানসংস্কৃতৌ দম্পতী পশ্যতি দীক্ষিতাবুভৌ ।
> সমং বুভুক্ষূ পরতোঽপি তৎফলং ততোঽস্য জাতো ময়ি ধর্মমৎসরঃ ॥
> ধ্রুবং স জানন্মম ধর্মবল্লভো মনঃ প্রিয়েৰ্ষ্যাকলহং মুহুর্মিথঃ ।
> সুখং বিভীর্মামপহায় রোষণাং মহেন্দ্রলোকেঽপ্সরসো জিঘৃক্ষতি ॥
> ইয়ং তু চিন্তা মম কীদৃশং তু তা বপুর্গুণং বিভ্রতি তত্র যোষিতঃ ।
> বনে যদর্থং স তপাংসি তপ্যতে শ্রিয়ং চ হিত্বা মম ভক্তিমেব চ ॥
> ন খল্বিয়ং স্বর্গসুখায় মে স্পৃহা ন তজ্জনস্যাত্মবতোঽপি দুর্লভম্ ।
> স তু প্রিয়ো মামিহ বা পরত্র বা কথং ন জহ্যাদিতি মে মনোরথঃ ॥
>
> *বুদ্ধচরিতম্*, ৮/৬১-৬৬ (অশ্বঘোষ, ১৯৭৮ : ১৪৭)

অর্থাৎ

> আমি সহধর্মচারিণী অনাথা, তিনি আমাকে দূর করে যদি ধর্ম আচরণ করতে চান তবে কোথায় তাঁর ধর্ম যিনি সহধর্মচারিণী ছাড়াই তপস্যা করতে ইচ্ছুক? অবশ্যই তিনি পূর্ববর্তী রাজা সুদর্শ প্রভৃতি পিতামহদের কথা শোনেন নি। এঁরা তো পত্নীদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছিলেন। তাই আমাকে ছাড়াই তিনি তপস্যা করতে ইচ্ছুক। যজ্ঞে বৈদিক বিধানের দ্বারা সংস্কৃত এবং দীক্ষিত, পরকালেও উভয়ে একত্রে ফলভোগে অভিলাষী দম্পতী তিনি দেখেন নি তাই আমার প্রতি ধর্মে এই কার্পণ্য! নিশ্চয়ই সেই ধর্মপ্রিয় গোপনে বারবার আমার ঈর্ষ্যা ও কলহপ্রিয় মনকে জেনে এবং সুখের অভাব

> আশঙ্কা করেছেন; তাই কোপনস্বভাবা আমাকে ছেড়ে স্বর্গের অপ্সরাদের গ্রহণ করতে অভিলাষী হয়েছেন। কিন্তু আমার চিন্তা এই, সেখানে সেই নারীরা কেমন দেহের গুণ ধারণ করে যার উদ্দেশ্যে তিনি ঐশ্বর্য এবং আমার ভক্তি ত্যাগ করে বনে তপস্যায় রত হয়েছেন? এ-নয় যে স্বর্গসুখে আমার অভিলাষ; আত্মসংযত ব্যক্তির তা দুর্লভও নয়। কিন্তু সেই প্রিয় আমাকে ইহলোকে বা পরলোকে কোন প্রকারে যেন ত্যাগ না করেন এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

যশোধরার উপর্যুক্ত বিলাপ থেকে আমরা একজন অসহায় নারীর করুণ আর্তনাদের কথা জানতে পারি। যশোধরার কোনো অপরাধ ছাড়াই সিদ্ধার্থ তাঁকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন বৃহত্তর মানবকল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই 'ক্ষুদ্রস্বার্থ ত্যাগ' একজন অবলা নারীর জন্য কতটা গ্রহণীয় কিংবা কষ্টকর – তা অবশ্যই ভেবে দেখার অবকাশ রাখে। যশোধরার এখানে অবশ্য করণীয় কিছু নেই। কারণ তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক অসহায় নারী এবং এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একধরনের শিকারও বটে।

কন্যা হিসেবে যশোধরা পিতামাতার ইচ্ছা ও ধর্মীয় বিধান অনুসারেই রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। বধূ হিসেবে আর দশটি নারীর মতো স্বামী-সংসার-স্বজন নিয়ে দিন অতিবাহিত করেন এবং পুত্রসন্তান জন্ম দিয়ে নিজের এবং পরিবারের আকাঙ্ক্ষাকেও পরিপূরণ করেন। তবে পরবর্তীকালে স্বামীর একাকী সংসারত্যাগের বিষয়টি তাঁর মনোকষ্টের কারণ হয় – যা একজন নারীর জন্য নিতান্তই স্বাভাবিক। এছাড়া রাজবধূ হিসেবে তাঁর কোনো সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভূমিকা ছিল না।

অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিতম্* গৌতমবুদ্ধের জীবনকাহিনির একটি সুস্পষ্ট বিবরণ। তিনি একজন নিপুণ কবি হিসেবে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বাস্তব ঘটনা অনুসরণে এই মহাকাব্যটি রচনা করেন। নারীর চরিত্র অঙ্কনে এবং নারীচরিত্রের ভূমিকার ক্ষেত্রেও তিনি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং সংযত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে তাঁর নারীচরিত্রগুলো ছন্দময় কাব্যিক ভাষার কারণে আরও প্রাণবন্ত, জীবন্ত ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমাজ-সংসারে নারীচরিত্রগুলোর যথাযথ ভূমিকা উল্লেখ করতে তিনি দ্বিধান্বিত হননি। তাই তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় রাজমহিষী, রাজপুত্রবধূ এবং অন্যান্য নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের একটি সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে *রামায়ণ-মহাভারতে*র মতো অপ্সরা চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষণীয়। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অপ্সরাদের যে একমাত্র কাজ পুরুষের মনোরঞ্জন, সে কথাটিও তিনি এই মহাকাব্যে উল্লেখ করতে ভোলেননি।

সৌন্দরনন্দম্ : *সৌন্দরনন্দম্* মহাকাব্যটি মহাকবি অশ্বঘোষের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অষ্টাদশ সর্গে বিরচিত এই মহাকাব্যের মূল বিষয় কাব্যরীতিতে রচিত 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ'। এই মূল বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কবি নানা উপমা, রূপক, দীপক, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসক্তি – এককথায় বিভিন্ন অলংকারের মধ্য দিয়ে পাঠকমনে অনুভবমূলক, চিন্তামূলক, আধ্যাত্মিক তথা দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং পরিণামে দার্শনিক চিন্তাই কাব্যটিতে প্রকটরূপ ধারণ করেছে।

গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ এবং তাঁর স্ত্রী সুন্দরীর প্রেমোপাখ্যানের মধ্য দিয়ে গৌতমবুদ্ধের জীবন এবং বাণীকে মূলভিত্তি করে বেশকিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নর-নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই মহাকাব্যে। নন্দ স্ত্রীর প্রতি গভীর কামাসক্তে নিমজ্জিত থেকে এবং পার্থিব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জীবনের মূল বিষয় 'মুক্তি'র কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। গৌতমবুদ্ধ তাঁর এই ভ্রম ভঙ্গ করে অসার জীবনের পথ থেকে তাঁকে মুক্তির পথে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই *সৌন্দরনন্দম্* মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, অশ্বঘোষ তাঁর ধর্মীয় অনুভূতিগুলোকে মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন :

(ক) যারা নিজ আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা নিজমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত; এবং

(খ) যারা অন্যের সাহায্য নিয়ে নিজমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত।

অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিতম্* প্রথম শ্রেণিভুক্ত এবং *সৌন্দরনন্দম্* দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। (Khosla, Sarla, 1986 : 22) আমরা নিম্নে *সৌন্দরনন্দম্* মহাকাব্যের স্বর্গের নাম এবং কাহিনি-সংক্ষেপ আলোচনা করব :

১ম সর্গ :	কপিলাবস্তু বর্ণন
২য় সর্গ :	রাজবর্ণন
৩য় সর্গ :	তথাগত বর্ণন
৪র্থ সর্গ :	ভার্যার প্রার্থনা (ভার্যাযাচিতকো)
৫ম সর্গ :	নন্দর সন্ন্যাস (নন্দপ্রব্রাজনো)
৬ষ্ঠ সর্গ :	ভার্যাবিলাপ
৭ম সর্গ :	নন্দবিলাপ
৮ম সর্গ :	স্ত্রীবিঘাত
৯ম সর্গ :	মদাপবাদ
১০ম সর্গ :	স্বর্গনিদর্শন
১১শ সর্গ :	স্বর্গাপবাদ

১২শ সর্গ : প্রত্যবমর্শ
১৩শ সর্গ : শীলেন্দ্রিয় জয়
১৪শ সর্গ : আদিপ্রস্থান
১৫শ সর্গ : বিতর্কপ্রহাণ
১৬শ সর্গ : আর্যসত্য ব্যাখ্যা
১৭শ সর্গ : অমৃতাধিস (অমৃতাধিগম)
১৮শ সর্গ : আজ্ঞা ব্যাকরণ

উপর্যুক্ত সর্গগুলোতে গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরের যে কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

নন্দ এবং তাঁর স্ত্রী সুন্দরী ভোগবিলাসের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এরূপ একদিনে গৌতমবুদ্ধ ভিক্ষার জন্য তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলে কেউ তাঁকে ভিক্ষা না দেওয়ায় তিনি চলে আসেন। এ কথা শুনে নন্দ অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বুদ্ধের নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ তাঁর কোনো কথা না শুনে নিজের ভিক্ষাপাত্রটি তাঁর হাতে তুলে দেন। নন্দ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন থাকার কারণে ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। নন্দের স্ত্রী সুন্দরীও স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং নানাভাবে বিলাপ করতে থাকেন। গৌতমবুদ্ধ আধ্যাত্মিকভাবে নন্দকে আকৃষ্ট করে আশ্রমে নিয়ে যান এবং প্রার্থিব কামনা-বাসনা ত্যাগ করে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা বিফল হলে স্বর্গের অপূর্ব সুন্দরী অপ্সরাদের দেখিয়ে গৌতমবুদ্ধ বলেন যে, তাঁর স্ত্রী অপ্সরাদের চেয়েও সুন্দরী কিনা। নন্দ এই অপরূপা অপ্সরাদের সান্নিধ্য কামনায় ব্যাকুল হলে তিনি নন্দকে গভীরভাবে তপস্যা করার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর নন্দ অপ্সরাদের লাভের জন্য তপস্যায় মগ্ন হন। বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ নানারকম উদাহরণ দিয়ে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এরূপ কামনাময় জীবন ক্ষণস্থায়ী। এভাবে নন্দ অপ্সরা-লাভের চিন্তা পরিত্যাগ করে গৌতমবুদ্ধের নিকট সত্য ও আলোকিত পথ দেখানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করলে গৌতমবুদ্ধ তাঁকে যথারীতি বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত করে গহিন অরণ্যে গভীর তপস্যা করতে নির্দেশ দেন। দীর্ঘসাধনার পর নন্দ 'অর্হৎ' হন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তিনি গৌতমবুদ্ধের চরণ বন্দনা করেন এবং সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, *সৌন্দরনন্দম্* মহাকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নন্দের বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ। এই বিষয়টিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে মহাকাব্যকার অশ্বঘোষ তাঁর *বুদ্ধচরিতম্* মহাকাব্যের ন্যায় বাস্তব চরিত্র ছাড়াও বেশ কিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এসব চরিত্রের মধ্যেও রয়েছে নর-নারী, দেবদেবী, অপ্সরা ইত্যাদি। এই মহাকাব্যটি আলোচনায়ও আমরা শুধু বাস্তব

নারীচরিত্রের জীবনকাহিনি তুলে ধরতে প্রয়াসী হব। আমরা এই মহাকাব্যটির নারীচরিত্রসমূহকে নিম্নলিখিত দুইভাগে ভাগ করতে পারি :

১। বাস্তব নারীচরিত্র :

সুন্দরী (গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের স্ত্রী)

২। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নারীচরিত্র :

অহল্যা (৭/২৫)

অক্ষমালা (৭/২৮)

উর্বশী (৭/৩৮, ৪২)

কালী (৭/২৯)

কুমুদবতী (৮/৪৪)

গঙ্গা (৭/৪০)

দিতি (৯/১৯)

মেনকা (৭/৩৯-৪০)

যমুনা (৭/৩৩)

রম্ভা (৭/৩৬)

শকুন্তলা (১/২৬)

শান্তা (৭/৩৪)

সরস্বতী (৭/৩১)

সরণ্যূ (৭/২৬)

স্বাহা (৭/২৫) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরী : অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দম্* মহাকাব্যের একমাত্র বাস্তব নারীচরিত্র সুন্দরী। তাঁর মূল পরিচয় হলো তিনি গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের স্ত্রী এবং রাজা শুদ্ধোদনের পুত্রবধূ। সুন্দরী প্রকৃত অর্থেই 'সুন্দরী', 'মানিনী' এবং 'ভামিনী'। শুধু তাই নয়, সুন্দরী উচ্চবংশজাত এবং স্ত্রী-জাতির মধ্যে তিনি অত্যন্ত ব্যতিক্রম। নন্দের যোগ্যতম স্ত্রী হিসেবে আমোদ-প্রমোদ এবং আনন্দে তাঁদের বিবাহিত-জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন নন্দকে আলোকিত জগতে নিয়ে আসার কারণে সুন্দরীর সুখময় জীবনস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষাদ নেমে আসে। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীর এই করুণ আর্তনাদের চেয়ে নন্দের মোহভঙ্গ করাকেই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় শোকে-দুঃখে কাতর এক বিপর্যস্ত নিঃসহায় রমণীর ব্যাকুলতা মূল্যহীন

এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সমাজ-সংস্কার এবং ধর্মাচার মানবীয় আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করে নেয়। তাঁর আর্তচিৎকারে শুধু সান্ত্বনার বাক্যই উচ্চারিত হয়। তাঁর স্বামীও এই দীর্ঘকালের প্রেমময় জীবনের মূল্য না দিয়ে ধর্মকেই গুরুত্ব দেন। আমরা নিম্নে সুন্দরীর অসহায় ও করুণ বিলাপের দুটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি :

> সংদৃশ্য ভর্তুশ্চ বিভূষণানি বাসাংসি বীণাপ্রভৃতীংশ্চ লীলাঃ।
> তমো বিবেশাভিননাদ চোচ্চৈঃ পঙ্কাবতীর্ণেব চ সংসসাদ ॥
> সা সুন্দরী শ্বাসচলোদরী হি বজ্রাগ্নিসংভিন্নদরীগুহেব।
> শোকাগ্নিনান্তর্হৃদি দহ্যমানা বিভ্রান্তচিত্তেব তদা বভূব ॥
>
> *সৌন্দরনন্দম্*, ৬/৩২-৩৩ (অশ্বঘোষ, ১৯৮০ : ১৩৬)

অর্থাৎ

> তার স্বামীর অলঙ্কার, বসন, বীণা ও অন্যান্য বিনোদন-দ্রব্য দেখতে দেখতে সে যেন অন্ধকারে নিমগ্ন হল; উচ্চকণ্ঠে সে আর্তনাদ করতে লাগলো – যেন সে পঙ্কে পতিত হয়েছে। সুন্দরীর বক্ষ শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে, নামছে, যেন বজ্রাগ্নিতে বিদীর্ণ এক গিরিগুহা, কেননা দুঃখের অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ; দেখে মনে হচ্ছিল তার চিত্ত বিভ্রান্ত।'

সুন্দরী রাজপুত্রবধূ, অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়ার কারণেই রাজপরিবারে তাঁর এই স্থান। কিন্তু সমাজের আর দশটি নারীর মতোই তিনি অসহায়, সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য পরমুখাপেক্ষী। তাঁকে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে আসার সাহসও করেনি। কারণ আমাদের এই সমাজ-সংসারে পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে ধর্মের স্থান সুউচ্চ শিখরে। নারীর এরূপ সামাজিক চিত্র চিরায়ত। সন্তান উৎপাদন ছাড়া যেন সমাজে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই – না পরিবারে, না সমাজজীবনে, না রাষ্ট্রীয়জীবনে। এভাবেই একজন নারীর জীবন ধীরে ধীরে নীরবে-নিভৃতে 'মহাপ্রয়াণে'র দিকে অগ্রসর হয়।

***শারিপুত্রপ্রকরণম্* :** *বুদ্ধচরিতম্* এবং *সৌন্দরনন্দম্* মহাকাব্যের মতো অশ্বঘোষের *শারিপুত্রপ্রকরণম্* নাট্যগ্রন্থটিও গৌতমবুদ্ধ কেন্দ্রিক। এই নাট্যগ্রন্থটিরও বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্ম, গৌতমবুদ্ধের শিক্ষা ও সংসারত্যাগ এবং শারিপুত্র ও মৌদ্‌গলায়নের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ।

মহাকাব্য রচনায় অশ্বঘোষ যেমন উত্তরসূরিদের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং অনুকরণীয়, নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অত্যন্ত সিদ্ধহস্তে তিনি এক্ষেত্রেও সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন এবং নাটকের যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন – তা অনুসরণ করেই পরবর্তীকালের নাটকগুলো পরিপক্বতা লাভ করেছে। *শারিপুত্রপ্রকরণম্* গ্রন্থের পাত্রপাত্রী, সংলাপ, উপস্থাপনা, চিত্রকল্প সব মিলিয়ে এই নাট্যগ্রন্থের যে খণ্ডাংশটুকু গবেষকদের হাতে এসেছে, তাতে অশ্বঘোষের নাট্যপ্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অশ্বঘোষের *শারিপুত্রপ্রকরণম্* নাট্যগ্রন্থে উল্লেখিত নারীচরিত্র হলো – গণিকা (মগধবতী) এবং চেটি।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গণিকা-প্রথার প্রচলন ছিল এবং গণিকারা সমাজে, রাষ্ট্রে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। এছাড়া গণিকারা তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। এদের প্রধান কাজ ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন। এই মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে অনেক গণিকাই আবার রাজষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন। গণিকাদের মধ্যে আবার স্তরভেদও ছিল। এই ধারাবাহিকতায় আমরা অশ্বঘোষের *শারিপুত্রপ্রকরণম্* নাট্যগ্রন্থের নারীচরিত্র গণিকা এবং তার পরিচারিকা হিসেবে চেটির উল্লেখ দেখতে পাই। এই নাট্যগ্রন্থ থেকে সমাজ-সংসারে তাদের ভূমিকার কথা জানা যায় না। তবে গণিকারা যে প্রেমক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিল তার প্রমাণ আমরা পাই গণিকার একটি সংলাপে :

> কিং খলু ইদানীং সুরতবিমর্দক্ষম... (অশ্বঘোষ, ১৯৮১ : ৭)

অর্থাৎ

> এখন কি তবে প্রেমক্রীড়াক্ষম...

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, *শারিপুত্রপ্রকরণম্* নাট্যগ্রন্থের খণ্ডাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপও তাই অসম্পূর্ণ। নাট্যগ্রন্থটিতে 'চেটি'র উল্লেখ থাকলেও তার কোনো সংলাপ নেই।

মহাকবি অশ্বঘোষের উপর্যুক্ত সাহিত্যকর্মে তৎকালীন সমাজে নারীজীবনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র লক্ষ করা যায়। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে বিরচিত নারীজীবন তৎকালীন সমাজ-সংসারে বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থা তেমন সুউচ্চ আসনে ছিল না। শুধু বৈদিকযুগের পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় কিছু সময় ব্যতীত নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মর্যাদার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বা তাদের প্রতি তেমন সম্মানও প্রদর্শন করা হয়নি। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রেও নারীজীবন এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা একইভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। যেমন, *বুদ্ধচরিতম্* মহাকাব্যে গৌতমবুদ্ধের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি কিংবা *সৌন্দরনন্দম্* মহাকাব্যে নন্দের মোহভঙ্গের বিষয়টি আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এসব ঘটনার অন্তরালে একজন মহীয়সী নারীর কামনা-বাসনা কিংবা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার উপেক্ষার বিষয়টি কাব্যকার প্রায় অনুচ্চারিতই রেখেছেন। *বুদ্ধচরিতম্* মহাকাব্যে পার্থিব কামনা-বাসনায় মোহাচ্ছন্ন মানুষের মুক্তি তথা মানবকল্যাণের বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর পেছনে গৌতমবুদ্ধের পত্নী যশোধরার আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়টিকে অশ্বঘোষও গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেননি কিংবা তাঁর মহান ত্যাগের বিষয়টিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। এ থেকেই বোঝা যায়, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীজীবন এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় কিভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়েছে। গৌতমবুদ্ধের মহান ব্রতলাভে তাঁর জীবনসঙ্গিনী যশোধরার অবদানের কথা প্রায় সকলেই অনুল্লেখিত রেখেছেন। একইভাবে মহাকবি *সৌন্দরনন্দম্* মহাকাব্যে সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি নন্দের প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাকে মোহাচ্ছন্ন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। স্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হওয়া জৈবিক দিক থেকে একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এই কামাসক্তিকে নন্দের মোক্ষলাভের পথে কাব্যকার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করতে মোটেই দ্বিধা করেননি। বরং নন্দের মোহভঙ্গের জন্য সুন্দরীর চেয়ে আরও সুশ্রী নারীকে ব্যবহার করতেও পিছপা হননি। তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে নারীর এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। *শারিপুত্রপ্রকরণম্* নাট্যগ্রন্থে মহাকবি অশ্বঘোষের গণিকা চরিত্রের অবতারণা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় গণিকারা সামাজিকভাবে উপেক্ষিত হলেও অভিজাত পুরুষ সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করার ক্ষেত্রে তাদের সাহচর্য সমাজে স্বীকৃত ছিল। এক্ষেত্রে স্ত্রীদের বাদ-প্রতিবাদের কোনো উল্লেখই নেই এবং তাদের করণীয় কিছুই ছিল না। অবশ্য সম্পূর্ণ নাট্যগ্রন্থটি পাওয়া গেলে গণিকাদের প্রতি কাব্যকার অশ্বঘোষের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যেত। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় যে, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে নারীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই প্রতিফলন এবং অশ্বঘোষ একজন মহাকাব্যকার হলেও তিনি একজন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম সফল প্রতিনিধি।

গ্রন্থপঞ্জি

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রমুখ সম্পাদিত ১৯৭৮। অশ্বঘোষ, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রমুখ সম্পাদিত ১৯৮০। অশ্বঘোষ, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রমুখ সম্পাদিত ১৯৮১। অশ্বঘোষ, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা

Dasgupta, S. N and S. K. De, 1947. *A History of Sanskrit Literature: Classical Period*, Vol. 1, University of Calcutta

Khosla, Sarla, 1986. *Aśvaghosa and his Times*, Intellectual Publishing House, New Delhi

Muller, F. Max, (Ed.), 1894. *Sacred Books of the East*, Vol. 49, Oxford University Press

Winternitz, Maurice, 1991. *A History of Indian Literature*, Vol. II, Munshiran Manoharlal publishers Pvt. Ltd, New Delhi